দুরূদ, সালাম ও প্রচলিত মীলাদের শর'ঈ বিধান

দুরূদ ও সালামের গুরুত্ব

১। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করার জন্য সকল ঈমানদারকে আহবান জানিয়েছেন।

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ "তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ করো, তোমরা যেখানেই থাকোনা কেনো তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়।

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর দুরূদ পড়া থেকে ভুলে থাকলো, সে বেহেশতের রাস্তা থেকে হটে গেল। (ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৯০৮, বাইহাকী শুআবুল ঈমান হাদীস নং ১৪৭২)

দুরূদ ও সালামের ফযীলত

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে, যে আমার উপর বেশী বেশী দুরূদ পাঠ করবে।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ তা'আলা বহু সংখ্যক ফেরেশতা এ কাজের জন্য নিয়োগ দিয়েছেন যে, তারা পৃথিবীর যমীনে বিচরণ করতে থাকবে এবং আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমার জন্য দুরূদ ও সালাম পাঠাবে তারা তা আমার নিকট পৌঁছে দিবে। (শুআবুল ঈমান, বাইহাকী হাদীস নং ১৪৮২, নাসাঈ হাদীস নং ১২৮০)
- হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, ফেরেশতাগণ নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট প্রেরণকারীর নাম উল্লেখ করে তার দুরূদ ও সালাম পেশ করে থাকেন।
- নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকালে আমার উপর দশবার দুরূদ পাঠ করবে এবং সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ পাঠ করবে কিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো। (ত্বারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ১/১২০)

দুরূদ ও সালাম সম্পর্কীয় মাসাইল

- কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের কারণে সারা জীবনে কমপক্ষে একবার দুরূদ পাঠ করা ফরযে আইন। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৪)
- যদি একই মজলিসে কয়েকবার নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম আলোচিত হয়, তাহলে প্রথমবার সকলের জন্য দুরূদ পাঠ করা ওয়াজিব, পরবর্তী প্রত্যেকবার নির্ভরযোগ্য মতানুসারে সকলের জন্য মুস্তাহাব। অবশ্য ইমাম ত্বহাবী রাহ. পরবর্তী প্রত্যেকবারও সকলের জন্য দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব বলেছেন। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৬)
- কেউ যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মুবারাক একই মজলিসে বারবার লিখেন, তাহলে তার হুকুমও অনুরূপ, অর্থাৎ প্রথমবার দুরূদ লিখা ওয়াজিব পরবর্তীবার লিখা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৬)
- বিনা উযূতে, শুয়ে-বসে, হাঁটা-চলা সর্বাবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ পড়া যায়।
- জুমু'আ বা ঈদের খুতবায় নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম আসলে অন্তরে অন্তরে দুরূদ পড়বে, মুখে উচ্চারণ করবে না।
- দুররে মুখতার কিতাবে উল্লেখ আছে, দুরূদ শরীফ পড়ার নিয়ম হলো, দিলে অত্যন্ত মুহাব্বাতের সাথে ধীরস্থিরভাবে হালকা আওয়াজে চুপে চুপে পড়বে। দুরূদ শরীফ পড়ার সময় দুলতে থাকা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেলাতে থাকা এবং উঁচু আওয়াজ করা উচিত নয়। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৯)

নতুন ঘর-বাড়ী, দোকান, অফিস ইত্যাদি উদ্বোধনের ক্ষেত্রে করণীয়ঃ

দুররে মুখতার কিতাবে আরো উল্লেখ আছে, দুরূদ শরীফ যথাস্থানে পড়বে। যেটা দুরূদ পড়ার কোনো স্থান নয় বরং দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্য সামনে আছে, এমন স্থানে দুরূদ পড়ার রসম বানানো বা দুরূদ পড়ার জন্য লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। যেমন: নতুন ঘর-বাড়ি, দোকান ইত্যাদি উদ্বোধন করার সময়। এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, দুই রাকা'আত শুকরিয়ার নামায পড়া বা হক্কানী আলেম দ্বারা বয়ানের ব্যবস্থা করা। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৮)

দুরূদ শরীফ পড়ার স্থান হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওযা শরীফ যিয়ারাতের সময়, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম বলা বা শোনার সময়, মসজিদের প্রবেশের সময় ও বের হওয়ার সময়, কোনো মজলিস থেকে উঠার সময়, দু'আ বা মুনাজাতের আগে এবং পরে। আযানের পর দু'আর আগে, উযূর শেষে, কিতাব বা চিঠিপত্র বা অন্য কিছু লিখার পূর্বে। বিপদ-আপদ, বালা-

মুসীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কোনো প্রথা পালন না করে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াত পাওয়ার আশায় বেশি বেশি দুরূদ পড়া। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৬, আল কাউলুল বাদী পৃ.৩১৮)

সহীহ মীলাদের পদ্ধতি

আমরা মুসলমান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মাত, পৃথিবীর সবকিছু থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুহাব্বাত এবং ভালবাসা সবচেয়ে বেশী। এটা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে সহীহ তরীকায় মীলাদ পড়া আমাদের কর্তব্য। হাকীমূল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. “ইসলাহুর রুসূম” গ্রন্থে মীলাদের সহীহ পদ্ধতি লিখেছেন, প্রচলিত মীলাদের সাথে সামঞ্জস্যতা না রেখে; দিন, তারিখ, সময়, পূর্ব থেকে নির্ধারিত না করে, ডাকাডাকি ছাড়া ঘটনাচক্রে কিছু লোক একত্রিত হয়ে গেল বা কোন প্রয়োজনীয় কাজে বা বয়ানের জন্য লোকদেরকে একত্রিত করা হয়েছিল, তখন উপস্থিত লোকদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত তরীকা এবং জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করা, এরপর কুরআন থেকে কিছু সুরা পড়ে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে হালকা আওয়াজে একাকী দুরূদ শরীফ পড়বে। অন্যের সাথে তাল মিলিয়ে সমষ্টিগতভাবে এক আওয়াজে পড়বে না। মীলাদে ইয়া নবী, ইয়া রাসূল, ইয়া হাবীব ইত্যাদি কিছুই পড়বে না, তাওয়ালুদ করবে না, কিয়াম করবে না, কেননা এসবের কোন ভিত্তি শরী‘আতে নেই।

উল্লেখ্য, নির্ভরযোগ্য কোন কোন কিতাবে মীলাদের কথা পাওয়া যায়, তার দ্বারা উদ্দেশ্য এই সহীহ তরীকার মীলাদ যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের আলোচনা হয় এবং সহীহ দুরূদ পড়া হয়। প্রচলিত গলদ মীলাদ কোন অবস্থায় তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং তারা কেউ এ গলদ মীলাদ পড়তেন না।

সমাজে যেভাবে মীলাদ-কিয়ামের প্রচলন রয়েছে

যেখানে একজন আলেম সাহেব তাওয়ালুদ পড়েন এবং কবিতা পাঠ করতে থাকেন, ফাঁকে ফাঁকে সকলে একসাথে দুরূদ পড়েন, এর মধ্যে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বা বসে ‘ইয়া নবী সালামালাইকা’, ‘ইয়া রাসূল সালামালাইকা’, ‘ইয়া হাবীব সালামালাইকা’ এরূপ দুরূদ পড়েন, এর কোনো দলীল কুরআন-হাদীসে নেই। এগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং মনগড়া, তাই এর থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা কর্তব্য। (সূরা আনআম-৫৯, সুরা নামল-৬৫, তাফসীরে কুরতুবী-১২/৩২২, নাসাঈ শরীফ-১২৮২, ফাতাওয়া কাযিখান-১/৩৩৪, আহসানুল ফাতাওয়া-১/৩৪৮)

উল্লেখ্যঃ তাওয়ালুদ নামে যা পড়া হয় এটা কুরআন-হাদীসে নেই। তারপর আরবী-ফার্সী-বাংলা কবিতা পড়া হয়, তাও শরী‘আতে নেই, তার অর্থও ভুল। “ইয়া নবী” ওয়ালা যে দুরূদ পড়া হয় তাও হাদীসের কোন কিতাবে নেই এবং আরবী গ্রামার এর দিক দিয়ে তা ভুল, তার অর্থও ভুল। তারপর নামাযের দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় বসে দুরূদ শরীফ পড়া উত্তম আর এখানে সেটা বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া হয় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ জীবদ্দশায় পছন্দ করেননি বরং নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ)

যেহেতু আমাদের সমাজে এ মীলাদ-কিয়াম নিয়ে বহু দিন থেকে বাক-বিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে, দেশের হক্কানী উলামায়ে কেরাম এটাকে নাজায়েয বললেও সাধারণ মানুষ এটাকে বিদ‘আত বলতে রাজি নয়, এর মূল কারণ হলঃ মীলাদ-কিয়ামের সমর্থক এর সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস জানেন না।

তাই মীলাদের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হল, যাতে সকলে এর প্রকৃত ইতিহাস জেনে এর থেকে বিরত থাকতে পারে।

মীলাদের ইতিহাস

প্রচলিত মীলাদের সূচনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে, তাবেঈন এবং তাবে-তাবেঈনের সময়ে প্রচলিত পন্থায় মীলাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ইসলামের সূচনাকাল থেকে সুদীর্ঘ ছয়শ বছর পর্যন্ত এই মিলাদের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে মিলাদ সমর্থক এবং মিলাদ বিরোধী সকলেই একমত। সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরী থেকে আজকের প্রচলিত মিলাদের যাত্রা শুরু হয়। এই মীলাদের এক জন বড় পৃষ্ঠপোষক মৌলভী আব্দুস সামী ‘আনওয়ার সাতিহাতে’ একথা স্বীকার করেছেন। চিত্তবিনোদনের জন্য এই মীলাদের আয়োজন করা বিশেষভাবে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখকে নির্দিষ্ট করে মীলাদ করার প্রচলন আগে ছিল না। এই প্রথা এসেছে হিজরী ৬০৪ এর শেষের দিকে। (বারাহীনে কাতেআহ, পৃ.১০৩, তারিখে মিলাদ পৃ.১৩)

মূলকথা হলো প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কার হিজরী ছয় শতকের পরে হয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়াঃ পৃ.১১৪)

মোট কথা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ২৩ বছর নবুওয়াতের যুগে, এরপর ১১ হিজরী থেকে চল্লিশ হিজরীর ১৭ রমযান আনুমানিক ত্রিশ বছর খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ। এরপর কমবেশি ১২০ হিজরী সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগ। এরপর কমবেশি ২২০ হিজরী পর্যন্ত তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগ। এরপর ৪০০ হিজরী পর্যন্ত ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের যুগ, অতঃপর আরো ৬০৩ হিজরী পর্যন্ত তৎকালীন উলামায়ে কেরামের যুগেও এই প্রচলিত মীলাদের অস্তিত্ব ছিল না। সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরী মোতাবেক ১২১৩ খ্রিষ্টাব্দে

আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রচলিত মীলাদের প্রচলন শুরু হয়। সুতরাং প্রচলিত মীলাদ নিঃসন্দেহে বিদ'আত এবং নাজায়েয। যার কোনো ভিত্তি শরী'আতে নেই।

প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কারকঃ

মীলাদ যারা সমর্থন করেন এবং যারা এর বিরোধিতা করেন, তাদের সকলেই এ বিষয়ে একমত যে হিজরী ছয় শতকে ইরাকের মসূল এলাকায় উমর বিন মুহাম্মাদ মসূলী এই প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কার করেন। (তারীখে মীলাদঃ পৃ.১৫)

মৌলভী আব্দুল হক মুহাজেরে মক্কী রাহ. এর লেখা কিতাব 'আদ দুররুল মুনাযযাম ফী হুকমি আমালি মাওলিদিন নাবিয়্যিল আযাম' পৃ.১৬০ এ মুফতী সা'দুল্লাহ সাহেব বলেন, প্রচলিত মীলাদ রবিউল আউয়াল মাসে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে সম্পাদন করার নিয়ম সর্বপ্রথম ইরাকের মসূল শহরে হয়েছে। এখানে উমর বিন মুহাম্মাদ সর্বপ্রথম এই মীলাদের আবিষ্কার করেন। (তারিখে মীলাদ পৃ.১৬)

মৌলভী মুহাম্মাদ আযম সাহেব লিখেন, জানা দরকার যে, এই পবিত্র মীলাদের আবিষ্কারক হযরত শায়খ উমর বিন মুহাম্মাদ মসূলী। (ফাতহুল ওয়দূদ পৃ.৮ এর সূত্রে তারিখে মীলাদ পৃ.১৬)

প্রচলিত মীলাদ সর্মথক জনাব মৌলভী আব্দুস সামী সাহেব লিখেন, সর্বপ্রথম এই প্রচলিত মীলাদ ইরাকের মসূল শহরে শায়খ উমর আবিষ্কার করেন। (আনওয়ারে সাতিহা সূত্রে বারহীনে কাতেআহ পৃ.১৬৪)

সারকথা হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের ছয়শত বছর পর্যন্ত এই মীলাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। হিজরী ৬০৪ সালে সর্বপ্রথম শায়খ উমর ইরাকের মসূল শহরে এই মীলাদের আবিষ্কার করেন। আর তার অনুসরণ করেছিলেন বাদশাহ আরবীল আবূ সাঈদ কাওকারী, তিনিই মূলত এই মীলাদের প্রসার করে ছিলেন। (বারাহীনে কাতেআহ পৃ.১৬৩-৬৪)

আবিষ্কারক কেমন ছিলেন?

প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কারক উমর বিন মুহাম্মাদ মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস বা ফকীহ কিছুই ছিলেন না। ইলম ও সম্মানের দিক দিয়ে তিনি একজন অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তার পরিচিতি মূলত বাদশাহ আরবীল এর মাধ্যমেই হয়েছে। অনেক বিজ্ঞ আলেম ও মহামানুষীগণ তীব্র ও কঠিন ভাষায় তার সমালোচনা করেছেন। যেমন: আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকেহানী বলেন, প্রচলিত মীলাদ আবিষ্কার করেছে ভ্রষ্ট ও চিত্তপুজারী লোকেরা এবং পেটপুজারী লোকেরা এর উপর গুরুত্বারোপ করেছে। (তারীখে মীলাদ পৃ.১৮)

প্রচলিত মীলাদ সর্বপ্রথম শায়খ উমর এবং বাদশাহ আরবীল আবিষ্কার করেছেন। তারা দুজনেই বিজ্ঞ আলেমদের কাছে অবিশ্বাসযোগ্য এবং অগ্রহণীয় ছিলেন। কারণ তারা উভয়েই গান-বাদ্য বাজাতেন। (তাওযীহুল মারাম ফী বায়ানিল মাওলিদি ওয়াল কিয়াম সূত্রে তারিখে মীলাদ পৃ.১৮)

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, মীলাদের আবিষ্কারক উমর বিন মুহাম্মাদ ছিল বিদ'আতী। বিজ্ঞ আলিমদের চোখে সে ছিল অবিশ্বাসযোগ্য। কোনো বিজ্ঞ আলমের চোখে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। আচ্ছা বলুন তো যে ব্যক্তি নিজেই তৎকালীন উলামায়ে কেরামের নিকট অগ্রহণযোগ্য ছিল। এমন একজন মানুষের আবিষ্কৃত আজকের প্রচলিত মীলাদ কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? আল্লাহ আমাদের বিবেকের দুয়ার খুলেদিন।

বিদ'আতের ভয়াবহ পরিণাম

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রচলিত মীলাদ ও কিয়াম বিদ'আত। আর বিদ'আত ভয়াবহ গুনাহের কাজ। এক দিকে এই বিদ'আত কুফুর, শিরিক এর পরেই সর্বাধিক ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক গুনাহ। অপর দিকে এ থেকে তাওবাও নসীব হয় না। কেউ সূদ, ঘুষ, মদ, জুয়াতে লিপ্ত হলে এগুলো গুনাহ মনে করে এক সময় তা থেকে তাওবা করে নেয় বা তাওবা করার প্রয়োজন মনে করে। কিন্তু বিদ'আত নাজায়েয ও কবীরা গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যত তা নেক আমলের মত হওয়ার কারণে সকলেই তা সাওয়াবের নিয়তে করে থাকে। এ কারণে কখনোই তা থেকে তাওবা করার প্রয়োজন মনে করে না। ভাবে সাওয়াবের কাজই তো করছি এর জন্য আবার তাওবা কিসের। পরিশেষে তাওবা করা ছাড়াই মারা যায়। এজন্য বিদ'আত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখা এবং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা সকলের জন্য জরুরী। কেননা হাদীসে বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা বিদ'আত বা নতুন আবিষ্কৃত আমল থেকে কঠোরভাবে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত আমলই বিদ'আতের মধ্যে গণ্য এবং প্রত্যেক বিদ'আঁতই গোমরাহী। (তিরমিযী পৃ.২৯২, আবূদাউদঃ২/২৭৯, মুসনাদে আহমাদঃ৪/২৭)

অপর এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বিদ'আতী ব্যক্তির নামায-রোযা, দান-সদকা, হজ্জ-উমরাহ, জিহাদ, ফরয ইবাদাত ও নফল ইবাদতসহ কোনো আমই কবুল করবেন না। আটার খামির থেকে চুল যেমন খুব সহজেই বের হয়ে আসে, ঠিক তেমনই বিদ'আতী ব্যক্তিও ইসলাম থেকে নিজের অজান্তেই বের হয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ পৃ.৬)

অপর এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক বিদ‘আতী ব্যক্তির জন্য তাওবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।’ (কানযুল উম্মাল ১/২২০)

সর্বোপরি বিদ‘আতে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই “দূর হও, দূর হও, যারা আমার পর বিদ‘আতে লিপ্ত হয়েছে” বলে হাউজে কাওসারের পানি থেকে চিরবঞ্চিত করে দিবেন। (বুখারী/মুসলিম)

বর্তমান সমাজে মীলাদ-কিয়ামের ব্যাপক প্রচারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক মসজিদে মীলাদও হয়, সাধারণ মুসল্লিরা ব্যবসায় উন্নতি, ছেলে-মেয়ের পরীক্ষায় পাস আর পড়া-লেখার উন্নতি, কামাই-রোজগারের উন্নতি, বালা-মুসীবত এবং বিভিন্ন পেরেশানি থেকে মুক্তিসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মীলাদ পড়িয়ে থাকেন, নতুন ঘর-বাড়ি বা দোকান হলে সেখানে বরকতের জন্য এবং সওয়াবের নিয়তে মীলাদ দিয়ে থাকেন। অথচ ইসলামে এর কোনো ভিত্তি-প্রমাণ নেই।

ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে, সাহাবা কেরামের যুগে এমনকি তাবেঈন এর যুগেও মীলাদ-কিয়ামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এ প্রচলিত মীলাদ-কিয়াম সম্পূর্ণ বিদ‘আত এবং নাজায়েয। সকলের কর্তব্যঃ এর থেকে বিরত থাকা এবং অন্যকে বিরত রাখা। নকল জিনিস দেখতে প্রায় আসলের মত হলেও দামে আসল জিনিসের মত হবে না। শুধু তাই নয়, আসলের মত বানাতে পেরেছে বলে নকলকারীকে পুরষ্কার দেওয়া হবে না, বরং নকল করার অপরাধে কঠিন শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।

যেহেতু সকল বিদ‘আত ইসলামে নকল আমল হিসেবে গণ্য, তাই বিদ‘আতকারী পুরষ্কারযোগ্য তো নয়ই বরং বিদ‘আত করার অপরাধে জাহান্নামের কঠিন শাস্তিযোগ্য। যদিও সাধারণ লোকদের নিকট বিদ‘আত দেখে তো বাহ্যত নেক আমলের মতোই মনে হয়, কিন্তু এটা যে বিদ‘আত এবং নকল আমল তা বুঝতে আমল বিশেষজ্ঞ তথা হক্কানী উলামায়ে কেরামের কোনো কষ্টই হয় না। তাই সকলের জন্য কর্তব্যঃ এ সকল বিদ‘আত কাজ থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা।

ফাতাওয়ার আলোকে প্রচলিত মীলাদ বিদ‘আত এবং নাজায়িয

অসংখ্য ফাতাওয়ার কিতাবে প্রচলিত মীলাদ ও কিয়ামকে বিদ‘আত ও নাজায়েয বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি ফাতাওয়ার কিতাবের প্রমাণ পেশ করা হলোঃ

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করা ও যিকির-আযকার করার মাঝে সওয়াব রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে জীবনবৃত্তান্ত আলোচনার জন্যে যে সুন্নাত পরিপন্থী গর্হিত নিয়ম-নীতি অবলম্বন করা হয়, এই নিয়ম সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবেঈন এর কোনো যুগেই ছিল না। এর দ্বারা সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে। এধরনের মজলিস থেকে দূরে থাকাই সওয়াবের কাজ। (সূত্র: খাইরুল ফাতাওয়া-১/৫৮৭)

২. প্রচলিত মীলাদ মজলিসের আয়োজন করা ভিত্তিহীন এবং বিদ‘আত, সুতরাং এটা নাজায়িয। (সুত্রঃ ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া-১/১৯০)

৩. বর্তমানে যে প্রথা স্বরূপ মীলাদের মজলিস কায়েম করে তথায় দ্বীনী বিষয় অজ্ঞ কবিদের কবিতা এবং গর্হিত ও মনগড়া বর্ণনা সুর দিয়ে পড়া হয় এবং এই প্রচলিত পন্থায় মীলাদ পড়াকে জরুরী মনে করা হয়, এই মীলাদ-মাহফিল সুন্নাত পরিপন্থী এবং বিদ‘আত। এই গর্হিত পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে কেরাম কারো থেকেই প্রমাণিত নেই।

৪. প্রচলিত পন্থায় যে মীলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়, তা কুরআন-হাদীস এবং ফিকহের কোথাও পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে কখনো এমন করেননি, তাবেঈনগণ করেননি, তাবে তাবেঈনগণ করেননি; আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দিসগণের কেউ করেছেন বলেও জানা যায়নি। ছয়শত হিজরী পর্যন্ত এই মীলাদ কেউ করেননি, এরপর সুলতান আরবিল সর্বপ্রথম এর প্রচলন ঘটায়।

এ ছাড়াও দেখুন: (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১১/৪৮, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া-২/২৮২, ইমদাদুল মুফতীন-১৭২, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৫/২৪৯, আযীযুল ফাতাওয়া-পৃ. ৯৮, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১/১৯৭, ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া-২২৮-২২৯, ইমদাদুল আহকাম-পৃ. ৯৫, জাওয়াহিরুল ফিকহ-১/২১১)